গবেষণার প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

কী করে বাঁচে শ্রমিক

বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির পক্ষ থেকে জুন-আগস্ট ২০১৮ সময় কালে গার্মেন্ট শ্রমিকদের জীবন মানের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের ছয়টি শ্রমিক এলাকার ৩১টি কারখানার মোট ২০০ জন শ্রমিক যাদের ৭৭ শতাংশ নারী। জরিপে গার্মেন্ট শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর হিসেবে নিচের দিকের পাঁচটি গ্রেডের শ্রমিকদের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ জরিপে অংশ নিয়েছেন- হেল্পার, সাধারণ অপারেটর, জুনিয়র অপারেটর, অপারেটর, এবং সিনিয়র অপারেটর হিসেবে কর্মরত শ্রমিকরা। মোট শ্রমিকদের মধ্যে এই পাঁচটি গ্রেডে কাজ করছেন ৯০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক। জরিপটি সমন্বয় করেছেন **তাসলিমা আখতার, জুলহাসনাইন বাবু , দীপক কুমার রায়, আব্দুল্লাহ নাদভী, মুসা কলিমুল্লাহ**। 'কী করে বাঁচে শ্রমিক' শিরোনামে এই গবেষণা প্রতিবেদন ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকায় প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণায় গার্মেন্ট শ্রমিকের জীবন যাপনের যে চিত্র উঠে এসেছে, তার উল্ল্যেখযোগ্য অংশ *সর্বজনকথার* পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো।

গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের গড় মাসিক আয়

নিচের সারণীতে একটি গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের গড় মাসিক আয় দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল মজুরীর সাথে ওভারটাইম বাবদ আয়, ও হাজিরা বোনাস যোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারের (বর্তমান ঠিকানায় বসবাসকারি) অপর ১ জন উপার্জনকারি সদস্যের আয়ও এখানে দেখানো হয়েছে।

গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের গড় মাসিক আয়

(ক)	গড় মাসিক মজুরী [হাজিরা বোনাস ও ওভারটাইম বাদে]	৬,০৫৫ টাকা
(খ)	গড় মাসিক ওভারটাইম [ঘণ্টা প্রতি গড় ওভারটাইম ৩২ টাকা,মাসে গড়ে ৬০ ঘণ্টা ওভারটাইম]	১,৯১৫ টাকা
(গ)	গড় মাসিক হাজিরা বোনাস	২৩৫ টাকা
(ঘ)	গার্মেন্ট শ্রমিকের মাসিক আয় [ক+খ+গ]	৮,২০০ টাকা
(ঙ)	পরিবারের অপর সদস্যের গড় মাসিক আয়	৭,৬৬৩ টাকা
(চ)	দুই জনের গড় মোট মাসিক আয় [ঘ+ঙ]	১৫,৮৬৩ টাকা

দেখা যাচ্ছে যে, **একজন গার্মেন্ট শ্রমিক প্রতি মাসে গড়ে মাত্র ৬,০৫৫ টাকা মজুরী হিসেবে পেয়ে থাকেন**। বর্তমানে গার্মেন্ট শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক মজুরী ৫,৩০০ টাকা। মালিক পক্ষ সচরাচর দাবি করে থাকেন প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট হয় এবং উপরের গ্রেডের শ্রমিকরা এর চেয়ে বেশি মজুরী পান, এবং এই সব মিলিয়ে একজন শ্রমিকের মোট মাসিক মজুরী আরও অনেক বেশি হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এবং উপরের গ্রেডের শ্রমিকদের বেতনসহ বিবেচনা করার পরও শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরী ৬ হাজার টাকার চেয়ে সামান্য বেশি।

জরিপে অংশগ্রহণকারি **শ্রমিকরা হাজিরা বোনাস হিসেবে মাসে গড়ে মাত্র ২৩৫ টাকা পেয়ে থাকেন**। সংসারের চাহিদার তুলনায় এ টাকা সামান্য হলেও এই সামান্য টাকার জন্যও শ্রমিকদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। জরুরি প্রয়োজনে এক দিন কাজ কামাই করলে, এমন কি খারাপ আবহাওয়ার কারণে কাজে পৌঁছাতে সামান্য দেরি হলেও এই হাজিরা বোনাসের টাকা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারি শ্রমিকদের মধ্যে ৯১ শতাংশই গত এক বছরে সকল মাসে হাজিরা বোনাস পাননি (গত ১২ মাসে ১ বা তার চেয়ে বেশি মাসে হাজিরা বোনাস কেটে রাখা হয়েছে)। আসলে হাজিরা বোনাস একটি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা, কারণ এই সামান্য টাকার জন্য শ্রমিকরা একটা ভয়ঙ্কর চাপের মধ্যে থাকেন।

এরপর আসছে ওভারটাইম বাবদ প্রাপ্ত টাকার কথা। শ্রমিকের মাসিক মজুরী এবং ওভারটাইম সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। শ্রমিকের মাসিক মজুরী দিয়েই তার সংসার চালাবার কথা, ওভারটাইম হলো বাড়তি আয়। কিন্তু মালিক পক্ষ মজুরী এবং ওভারটাইমকে সব সময়ই এক সাথে হিসাব করে মজুরী বৃদ্ধির বিপক্ষের যুক্তি হিসেবে হাজির করেন। এই জরিপে দেখা গেছে যে, একজন গার্মেন্ট শ্রমিক মাসে গড়ে ১,৯১৫ টাকা ওভারটাইম বাবদ পেয়ে থাকেন, এবং এ জন্য তাকে মাসে গড়ে প্রায় ৬০ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, একজন শ্রমিক সপ্তাহে কত ঘণ্টা ওভারটাইম করতে পারবে শ্রম আইনে এ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই কারখানা কর্তৃপক্ষ পে-স্লিপে কত ঘণ্টা ওভারটাইম করা হলো তা পরিস্কার করে লিখেন না, অথবা সে হিসাব আলাদা খাতায় করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারি শ্রমিকদের অনেকেই জানিয়েছেন তারা মাসে ৮০ থেকে ১০০ ঘণ্টা ওভারটাইম করেন। গার্মেন্ট শ্রমিকরা নিজেরাও এ বিষয়টি লুকিয়ে রাখতে চান। এ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা পে-স্লিপ বাড়িতে না নিয়ে ফেলে দেন, যাতে তার প্রকৃত আয়টি বাড়ির অন্য সদস্যরা (বিশেষ করে স্বামী) না জানতে পারেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে বছরের বারো মাসের গড় হিসেবে একজন শ্রমিকের মাসে ওভারটাইমসহ মোট ২২৪ ঘণ্টার বেশি কাজ করার কথা নয়। কিন্তু জরিপের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে একজন শ্রমিক মাসে ৬০ ঘণ্টা ওভারটাইম করছেন। এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসেবে নিয়মিত কাজ করছেন মাসে ১৯২ ঘণ্টা। এই দুটির যোগফল দাঁড়াচ্ছে ১৯২+৬০ = ২৫২ ঘণ্টা। অর্থাৎ শ্রম আইনে যে সীমা নির্ধারিত হয়েছে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘণ্টা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

এটা সবারই জানা যে, একজন মানুষের দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কায়িক শ্রমে যুক্ত থাকা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে গার্মেন্ট শ্রমিকরা মাসে ৬০ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করছেন। মাসে ২৬টি কর্ম দিবস ধরলে দেখা যায় যে নিয়মিত কর্ম ঘণ্টা অর্থাৎ ৮ ঘণ্টার পর এই শ্রমিকরা দৈনিক আরও ২.৫ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করছেন। অর্থাৎ একজন মানুষের সুস্থ থাকতে হলে যত সময় কাজ

করা দরকার গার্মেন্ট শ্রমিকরা তার চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি কাজ করছেন। অন্যভাবে বলা যায়, এই হিসেবে একজন গার্মেন্ট শ্রমিক ১০ বছরে গার্মেন্ট কারখানায় কর্মরত থেকে আসলে ১৩ বছরের সমান শ্রম দিয়ে থাকেন। আবার ঐ শ্রমিক যদি ২০ বছর গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করেন তাহলে তিনি আসলে ২৬ বছরের সমান শ্রম দেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে একজন গার্মেন্ট শ্রমিকের পরিশ্রম করার ক্ষমতা দ্রুত কমে আসে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, গার্মেন্টে কর্মরত শ্রমিকদের গড় বয়সের দিকে তাকালে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেশি বয়স হওয়া পর্যন্ত একজন শ্রমিক গার্মেন্টে কাজ করতে পারেন না। এ বিষয়টি পরবর্তিতে জরিপের ফলাফল থেকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আয়ের হিসেবে এছাড়াও রয়েছে পরিবারের অন্য একজন উপার্জনকারি সদস্যের মাসিক আয়। জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের অন্য একজন উপার্জনকারি সদস্যের মাসিক আয় ৭,৬৬৩ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই অন্য সদস্যটি অনানুষ্ঠানিক পেশায় কর্মরত আছেন। অনানুষ্ঠানিক পেশা বলতে বোঝানো হয়েছে যেখানে মজুরীর সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই যেমন: দিন মজুর, রিকশা চালানো, ভ্যান গাড়ি চালানো ইত্যাদি। এসব পেশার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তা না থাকা। নানা কারণেই কোন কোন মাসে আয় হয় খুব কম (যেমন: রিকশা জব্দ অভিযানের সময় একজন রিকশাচালকের কোন আয়ই থাকে না)। গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারগুলো এমন অনানুষ্ঠানিক পেশার ওপর নির্ভরশীরতার কারণে প্রায়শই বিপদে পড়েন। দেশে যদি জাতীয় ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা করা হতো তাহলে অনানুষ্ঠানিক পেশার ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর ওপর চাপ কমতো।

গার্মেন্ট শ্রমিকের নিজের আয় (হাজিরা বোনাস ও ওভারটাইমসহ) এবং পরিবারের অন্য একজন সদস্যের আয় যোগ করে দেখা যায়, একটি পরিবারের গড় মাসিক আয় মাত্র ১৫,৮৬৩ টাকা। এই সামান্য আয়ে একটি পরিবার কিভাবে চলে বা এর ফলে গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের জীবন মানের ওপর কি ধরনের প্রভাব পড়ে তা পরবর্তিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বেশি বয়স পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন

চিত্র ১ এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জরিপে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশের বয়স ৩০ বছরের বেশি। এ থেকে ধারণা করা যায় গার্মেন্টে কাজ করার জন্য যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় তা অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষেই দীর্ঘ দিন ধরে করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তাঁরা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

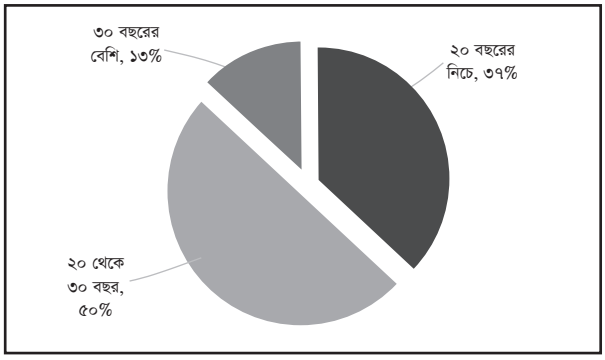

চিত্র ১: জরিপে অংশগ্রহণকারিদের গড় বয়স

জরিপে অংশগ্রহণকারি গার্মেন্ট শ্রমিকরা কে কত বছর ধরে এ খাতে যুক্ত আছেন তার চিত্রটি দেখলে এ কথা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে (চিত্র ২ দেখুন)। এ চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে ৬ বছরের বেশি সময় ধরে এ শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন এমন শ্রমিকের অনুপাত মাত্র ৩২ শতাংশ।

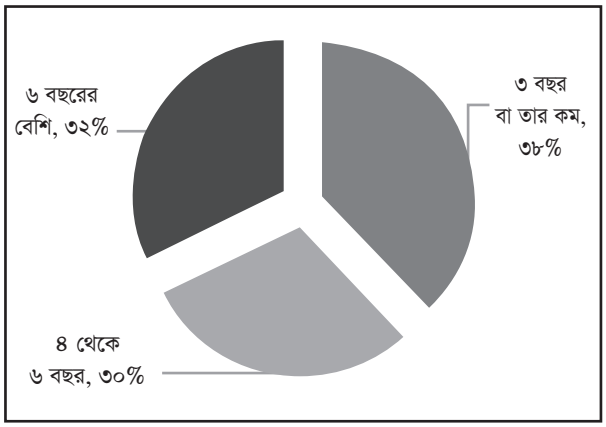

চিত্র ২: জরিপে অংশগ্রহণকারিরা কত বছর ধরে গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করছেন?

গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের খাতভিত্তিক গড় মাসিক ব্যয়

নিচে চিত্র ৩-এ একটি গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবার গড়ে প্রতি মাসে কোন খাতে মোট ব্যয়ের কত শতাংশ করে তা দেখানো হয়েছে।

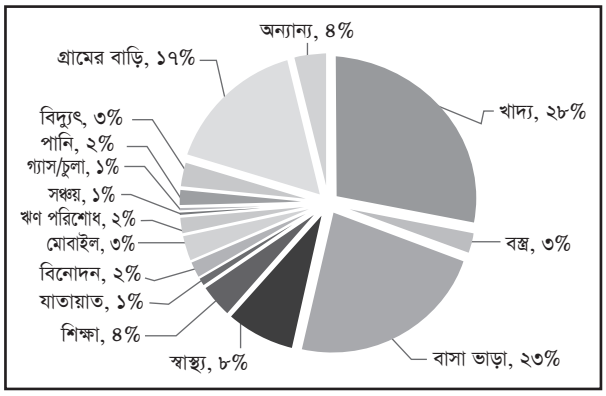

চিত্র ৩: গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের খাতভিত্তিক ব্যয় (মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে)

দেখা যাচ্ছে যে, একটি গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের ব্যয়ের প্রধান তিনটি খাত হলো খাদ্য, বাসা ভাড়া, এবং গ্রামের বাড়িতে (অর্থাৎ স্থায়ি ঠিকানায় বসবাসকারি পরিবারের সদস্যদের জন্য টাকা পাঠানো)। এ তিনটি খাতে গড়ে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের ২৮, ২৩ এবং ১৭ শতাংশ ব্যয় করতে হয়।

খাদ্য ও বাসা ভাড়া বাবদ মোট ব্যয়ের বড় অংশ ব্যয় করে গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারগুলো। তাদের মোট আয় খুব কম হওয়ায় খাদ্যের মান হয় খারাপ, বসবাসের জায়গাও হয় চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের তুলনামূলক ছোট অংশ ব্যয় করে গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবার (যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৮ শতাংশ)। তাদের আয় কম। তার ওপর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ও করেন তুলনামূলক কম। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে সার্বিক জীবন মানের ওপর। জরিপের ফলাফল থেকে এই বিরূপ প্রভাবগুরো আরও স্পষ্ট হয়েছে, যা পরবর্তিতে দেখানো হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো খাদ্য ও বাসা ভাড়ার পরই গড় হিসেবে সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত হলো গ্রামের বাড়িতে অর্থাৎ স্থায়ী ঠিকানায় বসবাসকারি পরিবারের সদস্যদের কাছে টাকা পাঠানো। এটা আগেই বলা হয়েছে গ্রামে বসবাসকারি পরিবারের সদস্যরা শহরের গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে এবং একইভাবে শহরে বসবাস-কারি গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারও গ্রামে থাকা পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভর করে (যেমন: ১৯ শতাংশ গার্মেন্ট শ্রমিক জানিয়েছেন যে তারা গ্রামের বাড়ি থেকে আসা চাল বা অন্য শস্যের উপর নির্ভরশীল)।

চাহিদা মত খাবার খেতে পারেন না গার্মেন্ট শ্রমিক

আগেই দেখানো হয়েছে যে শ্রমিক পরিবারগুলো আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাবার খরচ কমিয়ে দেয়। পরিবারের সকল সদস্যের খাদ্যাভাসের হিসাব না নিয়ে এই জরিপে কেবল গার্মেন্ট শ্রমিকের খাদ্যাভ্যাসের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একজন শ্রমিকের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো এখানে দেয়া হলো-

- ১৯ শতাংশ শ্রমিক মাসে একবারও গরু বা খাসির মাংস খান না।
- ১৬ শতাংশ শ্রমিক মাসে একবারও মুরগির মাংস খান না। যারা এক বা একাধিকবার মুরগির মাংস খান তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফার্মের মুরগি খান (খরচ বাঁচাতে)।
- ৩৪ শতাংশ শ্রমিক মাসে একবারও বড় মাছ খান না।
- একজন শ্রমিক সপ্তাহে গড়ে ৩ বার ডিম খান।
- একজন শ্রমিক সকালের নাস্তায় সবচেয়ে বেশি যে খাবার গুলো খান সেগুলো হলো ভাত (৭৯ শতাংশ শ্রমিক), সব্জি (৪৪ শতাংশ শ্রমিক), এবং ছোট মাছ (১৯ শতাংশ শ্রমিক)।
- একজন শ্রমিক দুপুরের সবচেয়ে বেশি যে খাবার গুলো খান সেগুলো হলো ভাত (৮১ শতাংশ শ্রমিক), সব্জি (৮৪ শতাংশ শ্রমিক), এবং ছোট মাছ (৩৪ শতাংশ শ্রমিক)।
- রাতে একজন শ্রমিক যে খাবারগুলো সবচেয়ে বেশি খান সেগুলো হলো ভাত (৮৯ শতাংশ শ্রমিক), সব্জি (৬৪ শতাংশ শ্রমিক), এবং আলু ভর্তা (৬২ শতাংশ)।

এই জরিপে উঠে এসেছে যে একজন শ্রমিক তার নিজের খাবার বাবদ মাসে গড়ে ১,১১০ টাকা খরচ করে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগের হিসাব অনুসারে ৮ ঘণ্টা কাজ করার জন্য একজন শ্রমিকের প্রতিদিন ২,৮০০ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপাদন করতে পারে এমন পরিমাণে খাবার খেতে হবে। আর চলতি বাজার দর অনুসারে ওই পরিমাণ খাবারের জন্য খরচ করতে হবে অন্তত ১০৯ টাকা প্রতিদিন। অর্থাৎ মাসে খরচ করতে হবে ৩,২৭০। অর্থাৎ গার্মেন্ট শ্রমিকরা বর্তমানে নিজের খাবারের পেছনে যত টাকা খরচ করা দরকার, তার এক-তৃতীয়াংশ খরচ করছেন। গার্মেন্ট শ্রমিকের নিজের খাওয়া-দাওয়ার অবস্থা থেকেই তার পরিবারের বাকি সদস্যদের খাওয়া-দাওয়ার করুণ অবস্থাটুকু বুঝে নেয়া সম্ভব।

রোগ-ব্যাধি লেগেই থাকে

৩৯ শতাংশ শ্রমিক গত এক বছরের মধ্যে বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আর একই সময়ে ছোট-খাটো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন সবাই। চিত্র ৪ ও ৫ এ যথাক্রমে গার্মেন্ট শ্রমিকরা গত এক বছরে প্রধানত যে বড় রোগ এবং ছোট-খাটো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন সেগুলো দেখানো হলো:

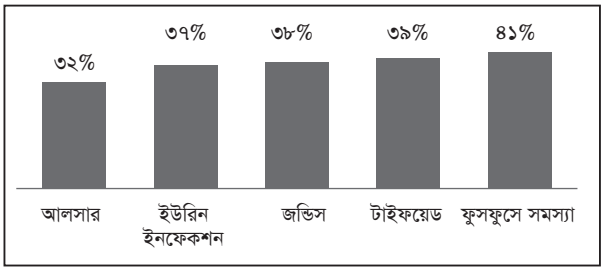

চিত্র ৪: গত এক বছরে গার্মেন্ট শ্রমিকরা প্রধানত যে সব বড় রোগে ভুগেছেন

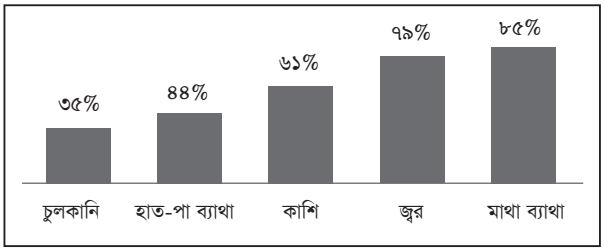

চিত্র ৫: গত এক বছরে গার্মেন্ট শ্রমিকরা প্রধানত যে সব ছোট-খাটো রোগে ভুগেছেন

এছাড়াও জরিপে অংশগ্রহণকারিরা জানিয়েছেন গত এক বছরে তাদের মধ্যে শতকরা ৫৯ জন রোগে আক্রান্ত হয়ে ছুটি নিয়েছেন। এছাড়াও শতকরা ২৭ জন শ্রমিক কর্মজীবনে কোন না কোন সময় রোগে আক্রান্ত হয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে গার্মেন্ট শ্রমিকরা যেসব বড় রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং যেসব ছোট-খাটো রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার পেছনে আছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা এবং বসবাস করা। এছাড়াও নিম্ন মানের খাবার খাওয়ার কারণেও এসব রোগে তাদের ভুগতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো এসব মারাত্মক রোগে যারা নিয়মিত আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাও অপ্রতুল। মান সম্মত চিকিৎসার সুযোগ নেই বললেই চলে

'ছোট-খাটো' রোগ-ব্যাধি হলে ৭৪ শতাংশ গার্মেন্ট শ্রমিক নিকটস্থ ঔষধের দোকানে বিক্রেতার পরামর্শ মতো ঔষধ খেয়ে নেন। কারখানার মেডিকেল সেন্টারে যান ৬০ শতাংশ গার্মেন্ট শ্রমিক, কিন্তু কারখানার মেডিকেল সেন্টারের সুবিধাদি নিয়ে প্রায় কেউই সন্তুষ্ট নন (যে কোন সমস্যা নিয়ে গেলেই ব্যথানাশক ট্যাবলেট দেয়া হয়)। শতকরা ২৮ জন গার্মেন্ট শ্রমিক ছোট-খাটো রোগ সারানোর জন্য ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেন।

বড় ধরনের রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক (শতকরা ২৭ জন) নিকটস্থ ঔষধের দোকানে গিয়েই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। ঝাড়ফুঁক, ওঝা বা হুজুরের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন ৩৪ শতাংশ গার্মেন্ট শ্রমিক। এটা তারা করেন প্রধানত টাকা ও সময় বাঁচানোর জন্য। বড় ধরনের রোগের ক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ শ্রমিক বেসরকারি ক্লিনিকে যান। এসব ক্লিনিকে ব্যয় বেশি হলেও শ্রমিক এলাকার কাছাকাছি কম খরচের সরকারি হাসপাতাল না থাকায় তারা এমন সিদ্ধান্ত নেন।

কর্মরত অবস্থায় সন্তান-সম্ভবা হওয়ার অনেক চ্যালেঞ্জ

কর্মরত অবস্থায় ১৫ শতাংশ নারী গার্মেন্ট শ্রমিক সন্তান সম্ভবা হন। এই অনুপাতটি ছোট হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো সন্তান সম্ভবা

হওয়ার আগেই অনেক নারী শ্রমিক গার্মেন্টে কাজ করা বন্ধ করে দেন। কর্মরত অবস্থায় যারা সন্তান সম্ভবা হন তাদের মধ্যেও ৬৩ শতাংশ সন্তান সম্ভবা হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেন। যাদের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপযোগি সন্তান আছে তাদের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশই ঠিক মতো সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সুযোগ পান না, আর এর ফলে তাদের নানা রকম শারীরিক সমস্যাতেও ভুগতে হয়। এছাড়াও মাত্র ২৯ শতাংশ নারী শ্রমিক জানিয়েছেন যে তাদের কারখানায় ডে কেয়ার সুবিধা আছে এবং কোনটিতেই পর্যাপ্ত জায়গা ও অন্যান্য সুবিধাদি নেই।

সন্তানের যত্ন আর পড়ালেখা নিয়ে ভোগান্তি

শতকরা ৪০ টি গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারে সন্তানদের মধ্যে সবাই অথবা কেউ কেউ গ্রামের বাড়িতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বসবাস করে। ব্যয় সাশ্রয় করার জন্য এবং/অথবা সন্তানদের দেখভাল করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় তাদের বাবা ময়েরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের সন্তানদের শতকরা ৪১ ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে সন্দেহ থাকলেও টাকা বাঁচানোর জন্য অনেকেই সন্তানকে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠান। আবার অনেক গার্মেন্ট শ্রমিক (শতকরা ৩১ ভাগ) বেশি ব্যয় হবে জেনেও বাচ্চাদের বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনে পাঠান, কারণ তাদের বসবাসের এলাকার আশেপাশে ভালো মানের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। শতকরা ২৩ ভাগ গার্মেন্ট শ্রমিক তাদের সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়ান। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো– মাদ্রাসায় বাচ্চাদের কম খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে (কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ডে-কেয়ারের বিকল্প হিসেবে কাজ করে)।

অল্প জায়গায় অনেক মানুষকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়

নিচের সারণিতে জরিপে অংশগ্রহণকারিদের থাকার জায়গার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ৭০ শতাংশ অংশগ্রহণকারি জানিয়েছেন যে তাদের বাসায় কোন বারান্দা নেই। এছাড়াও প্রতিটি গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারকে গড়ে আরও ৪টি পরিবারের সঙ্গে বাথরুম, টয়লেট, পানির কল ও চুলা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়।

আগেই দেখানো হয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক পরিবারের ব্যয়ের বৃহত্তম

	শ্রমিকের অনুপাত	মোট জায়গা (বর্গফিট)	বসবাসকারির সংখ্যা	জনপ্রতি বর্গফিট
মেসে একা থাকেন	১৫%	১৬৫	৭	২৪
১ রুমের বাসায় পরিবার নিয়ে থাকেন	৬৭%	১১০	৪	২৮
২ রুমের বাসায় পরিবার নিয়ে থাকেন	১৪%	২৩৩	৪	৫৮
২ এর অধিক রুমে পরিবার সহ থাকেন	৪%	২৮৯	৪	৭২

খাত হলো বাসা ভাড়া। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আয়ের বড় অংশ বাসা ভাড়ার পেছনে ব্যয় করার পরও শ্রমিক পরিবারগুলোর দুই তৃতীয়াংশই ছোট এক কামরার বাসায় ভাড়া থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, যেখানে মা-বাবা, দাদা-দাদী এবং শিশুরা সকলে একসঙ্গে থাকেন (জন প্রতি জায়গা মাত্র ২৮ বর্গফিট)।

পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম হয় না

যিনি ৮ ঘণ্টা কাজ করেন, তার ৮ ঘণ্টা ঘুম এবং ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও বিনোদনের দরকার। কিন্তু জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গার্মেন্ট শ্রমিকরা গড়ে ৬ ঘণ্টা ঘুমান (অনেকে দৈনিক মাত্র ৩-৪ ঘণ্টও ঘুমান) এবং বিশ্রাম নেন ১.৫ ঘণ্টা। টেলিভিশন দেখা তাদের বিনোদনের প্রধানতম মাধ্যম।

প্রচন্ড পরিশ্রমের পরও একজন গার্মেন্ট শ্রমিক ঘুমানোর বা বিশ্রাম নেয়ার সময় পান না, তার জন্য নেই যথেষ্ট বিনোদনের ব্যবস্থাও। অনেক গার্মেন্ট শ্রমিক মনে করেন এ কারণে অনেক শ্রমিক (বিশেষ করে কম বয়সী পুরুষ শ্রমিক) মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন।

জরিপের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গার্মেন্ট শ্রমিকের নিজের আয় (হাজিরা বোনাস ও ওভারটাইমসহ) এবং পরিবারের অন্য সদস্যের আয় যোগ করে পরিবারের যে মাসিক আয় দাঁড়ায় সেটিও ন্যূনতম চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। আর এর ফলে শ্রমিক পরিবারগুলো মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। এর নেতিবাচক প্রভাব শুধু শ্রমিকদের ওপর পড়ছে তা নয়, সাথে সাথে অনিশ্চয়তায় পড়ছেন পরবর্তী প্রজন্মও।

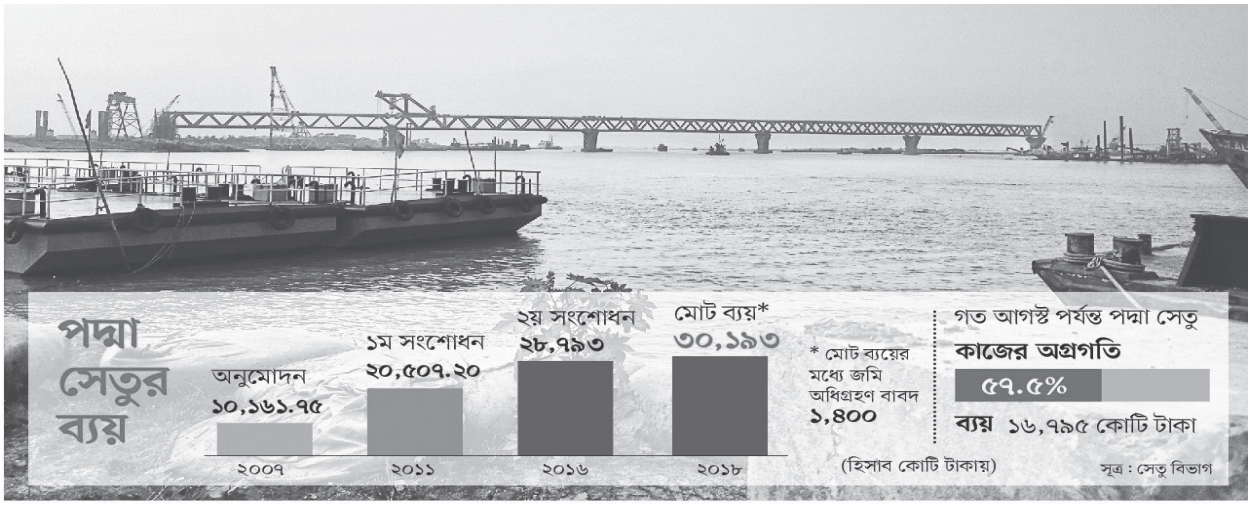

এখন পর্যন্ত মূল সেতুর ৪১টি পিলারের মধ্যে ১৪টির কাজ শেষ হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর, শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্ট। ছবি : প্রথম আলো